কারেন্সি ওয়ার

মানুষের টাকা চুরির সবচেয়ে চতুর কৌশল

আইদারুস ইবনে আবদুল্লাহ আল আইদারুস

অনুবাদ। সাজ্জাদ হুসাইন

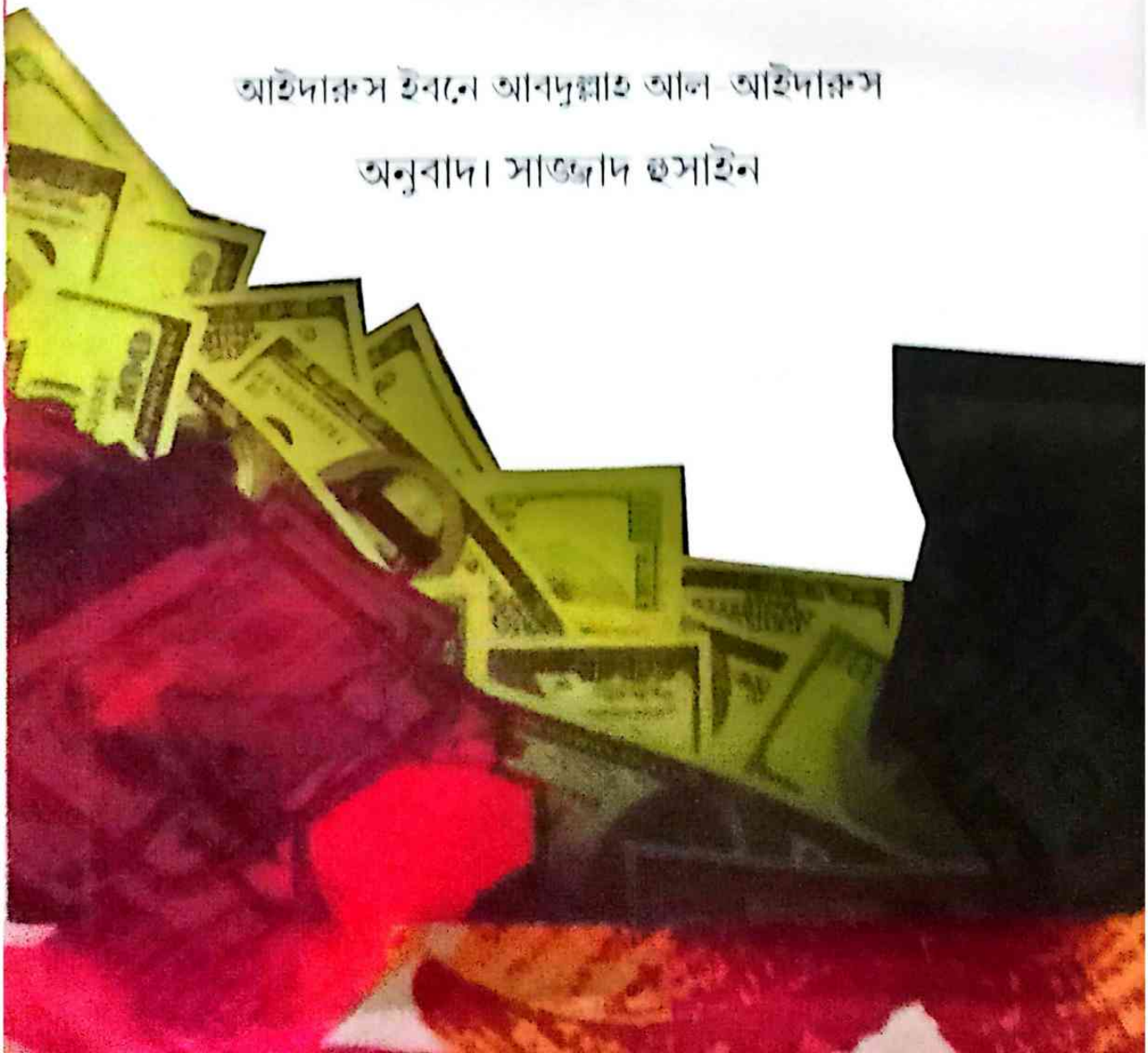

সূচিপত্র

শোষণ-নির্ভর ব্যবস্থার দুটি দিক : কমিউনিজম ও পুঁজিবাদ ১৩
এই অভিযোগের প্রমাণ ১৩
সম্পদ চুরির সবচেয়ে নিপুণ কৌশল ১৪
মার্কিন ডলারের ইতিহাস ১৫
এই মুদ্রাব্যবস্থা কতদিন ছিল? ১৫
যুদ্ধের পরিণতি ১৬
কীভাবে মানুষকে এমন মূল্যহীন ডলার গ্রহণে বাধ্য করা হয়? ১৬
তখনকার ডলারের মান ১৬
মূল্যস্ফীতির সূচনা ১৬
১৯২৯ সালের মহামন্দা (The Great Depression) ১৬
ব্রেটন উডস চুক্তি কী? এর গুরুত্ব কী ছিল? ১৮
চুক্তির বিবরণ ১৮
সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ১৮
কেন ডলার বিশ্বমুদ্রা হয়ে উঠল? ১৯
ভিয়েতনাম যুদ্ধ, নিক্সন শক এবং ডলারের স্বর্ণমুদ্রা-সমর্থন বাতিল ২০
নিক্সন শকের নেপথ্যে ২১
মূল্যহীন কাগজ যেভাবে 'স্বর্ণ' হয়ে ওঠে ২২
পেট্রোডলার ধারণা (Petro Dollar) ২৩
রথসচাইল্ড পরিবার ও বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের গল্প ২৪
ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা সম্পন্ন ২৫
রথসচাইল্ড পরিবারের ক্ষমতা দখলের সূচনা ২৬

গল্পের নতুন মোড় : ফেডারেল রিজার্ভ ২৯
অর্থযুদ্ধে মৃত্যুর মিছিল ৩০
আগুনের জ্বলে ওঠা ছাই ৩০
কেন্দ্রীয় ব্যাংক না-কি ইহুদি ব্যাংক? ৩১
স্বর্ণ (Gold) ৩৩
মুদ্রা ও অর্থ ৩৪
স্বর্ণ ও রৌপ্যের লুকোনো রহস্য ৩৬
আঙ্কেল স্যামের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা ৩৬
আইন বানিয়ে টাকা চুরির গল্প ৩৭
CIA-এর চক্রান্ত ও লন্ডন গোল্ড পুল ৩৮
থিঙ্ক ট্যাঙ্কসের ভূমিকা ৩৮
টাকা তৈরির খেলা ৪২
ট্যাক্সের রহস্য! ৪৪
ঋণের চক্র, টাকার চক্র ও ডলারের পতন-ধ্বনি ৪৪

“

দুটি বিষয়ের কোনো সীমানা নেই, একটি হলো মহাবিশ্ব, আর অন্যটি মানবজাতির অজ্ঞতা। –আলবার্ট আইনস্টাইন

তার সঙ্গে এখন মানুষের লোভকেও যুক্ত করুন। কারণ মানুষের লোভেরও কোনো সীমারেখা নেই।

”

শোষণ-নির্ভর ব্যবস্থার দুটি দিক : কমিউনিজম ও পুঁজিবাদ

কমিউনিজমের সাথে সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষা করার কোনো সম্পর্ক নেই। আর অতিমাত্রায় ভোগবাদী, হৃদয়হীন পুঁজিবাদ, সেটার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও কমিউনিজম থেকে খুব একটা আলাদা নয়।

এই দুটি ব্যবস্থা আসলে একই জিনিসের দুই রূপ। এগুলো এমন এক ধারণা, যা তৈরি করেছে দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকেরা। একটা মতবাদ শেষ হলে তারা সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা চাপিয়ে দেয়।

সে চিন্তা যদি হিন্দুধর্মের হয়, তাও তাদের চলবে। যদি ইসলামি চিন্তা হয়, তাও তারা ব্যবহার করবে। **তাদের একটাই লক্ষ্য, একটাই শর্ত, পৃথিবী যেন কেবল তাদের নিয়ন্ত্রণেই থাকে।**

এই অভিযোগের প্রমাণ

ঠিক যে বছর 'হৃদরোগে' আক্রান্ত হয়ে কমিউনিজম মারা যায়, সে বছরই যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে আক্রমণ করে বসে। তারা হাসপাতাল, স্কুলসহ সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। তারপর আরোপ করে এক নিষ্ঠুর অবরোধ, যার ফলে পাঁচ লাখেরও বেশি ইরাকি শিশু মৃত্যুবরণ করে![১]

---

১. মানে হচ্ছে, কমিউনিজম যে অজুহাতে বিভিন্ন জাতির ওপর দখল নিয়েছে, তাদের সম্পদ লুট করেছে, মানুষকে দাস বানিয়েছে এবং হত্যাও করেছে, সেই অজুহাত তখনই শেষ হয়ে গেছে, যখন আমেরিকা নিজেই ইরাকে হামলা চালিয়ে তার তেলের ভান্ডার দখল করে নিয়েছে। আমেরিকা তো একটুখানিও ধৈর্য ধরেনি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার একটা বছর না যেতেই তারা প্রমাণ করে দিল, আসলে তারা নিজেরাই মিথ্যা বলছিল এতদিন!

মূলত অর্থের প্রতি তাদের কোনো আবেগ নেই। তাদের কাছে মানুষেরও নেই কোনো মূল্য! তারা শুধু নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্বের সম্পদ ভোগ করে যেতে চায়।

বিশ্বের একাধিক অর্থনীতিবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, একুশ শতকের মানুষরা এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যে বিপর্যয় এ পৃথিবী তার ইতিহাসে কখনো দেখেনি!

সম্পদ চুরির সবচেয়ে নিপুণ কৌশল

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইনস (John Maynard Keynes) বহু বছর আগে বলেছিলেন,

'মার্কিন সরকার এমন গোপনভাবে জনগণের সম্পদ লুট করতে সক্ষম হবে যে, প্রতি এক মিলিয়ন মানুষের মধ্যে মাত্র একজন তা বুঝতে পারবে!'

কেইনসের সময়ে এটা হয়তো গোপন রাখা যেত। কিন্তু এখন? এখন তো আমরা 'ইন্টারনেট-যুগে' বসবাস করছি। এভাবে জালিয়াতি আর কতদিন চলবে?

> দুঃখজনকভাবে আজ মানুষ অদ্ভুত এক সম্মোহনে আচ্ছন্ন! আর এই সম্মোহন ঘটিয়েছে গণমাধ্যম।

আজকের দিনে তিক্ত বাস্তবতা হলো, কোনো গণমাধ্যমকর্মীকে এসব বিষয়ের ধারেকাছেও যেতে দেওয়া হয় না।[২]

---

২. প্রশ্ন হলো, আমরা অনেক শাসকের বিরুদ্ধে মিডিয়ার রিপোর্ট দেখে তাদের পতন হতে দেখেছি। কিন্তু এই বড় বড় চোর পরিবারগুলোর মুখোশ কেন কোনোদিন মিডিয়া উন্মোচন করেনি? কেন তাদের বিরুদ্ধে কখনো কোনো বড় সংবাদ প্রতিবেদন হয়নি?
বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, গণমাধ্যম ও মিডিয়া মূলত কয়েকটি বড় শাখায় বিভক্ত থাকে : থিয়েটার বা নাট্যমঞ্চ, সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, রেডিও, অনলাইন ওয়েবসাইট ইত্যাদি। আর এখন আমার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত একটি নাম যুক্ত করুন—সোশ্যাল মিডিয়া।
এই সবকিছু যেখানেই থাকুক, যেই দেশেই থাকুক, দিনশেষে এগুলোর উৎসমূল হচ্ছে সুনির্দিষ্ট কিছু আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা। যেমন : রয়টার্স (Reuters), ফক্স নিউজ (Fox News), বিবিসি

মার্কিন ডলারের ইতিহাস

মার্কিন ডলার সর্বপ্রথম চালু হয় ১৭৯২ সালে। তখন ডলার শুধু কাগজের মুদ্রা ছিল না; বরং এটি ছিল তিনটি ধাপে বিভক্ত এক বাস্তব মুদ্রা :

- সবচেয়ে মূল্যবানটি ছিল সোনার তৈরি।
- তার নিচের স্তরটি ছিল রুপার তৈরি।
- আর সবচেয়ে কম দামিটি ছিল তামার তৈরি।

এই তিন ধরনের মুদ্রা ১৭৯২ সালেই যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি মুদ্রা হিসেবে অনুমোদিত হয়।

এই মুদ্রাব্যবস্থা কতদিন ছিল?

এই ধাতব-ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ১৮৬১ সাল পর্যন্ত। এই বছরেই নর্থ আমেরিকা ও সাউথ আমেরিকার মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

এই সময় উত্তর আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকার যুদ্ধ চালাতে আরও অর্থের প্রয়োজন অনুভব করে।

কিন্তু তারা নিজেদের সব সোনা ও রুপা খরচ করে ফেলতে চায়নি। তাই তারা ১৮৬২ সালে এক নতুন সিদ্ধান্ত নেয়, তারা কাগজের ডলার তৈরি করে, যেটি ছিল আজকের পরিচিত সবুজ রঙের মার্কিন ডলারের সর্বপ্রথম রূপ।

(BBC), সিবিএস (CBS) এবং এমন আরও একাধিক সংবাদসংস্থা। আর হ্যাঁ, আমার পক্ষ থেকে আরেকটি নাম যুক্ত করুন—উইকিপিডিয়া।
এদের সবগুলোর মালিক বা উচ্চপদস্থ নির্বাহীরা হয়তো সরাসরি ইহুদি, অথবা এই গোপন ধনকুবের পরিবারগুলোর হাতের পুতুলমাত্র।

যুদ্ধের পরিণতি

যুদ্ধের শেষে ৪৬১ মিলিয়ন (৪৬ কোটি ১০ লাখ) মার্কিন ডলার কাগজে ছাপানো হয়। তবে তখন এই কাগুজে ডলার স্বর্ণ-সমর্থিত ছিল না। (স্বর্ণ-সমর্থিত মুদ্রা বা gold backing বলতে বোঝানো হয়, আপনি যখনই ইচ্ছা তখনই কাগজের টাকাটি নিয়ে গিয়ে সরাসরি সমমূল্যের সোনা পেতে পারেন। কারণ তখন কাগজের টাকার প্রকৃত মূল্য ছিল সোনা, আর সেটি সরকার মজুদ করে রাখত।)

কীভাবে মানুষকে এমন মূল্যহীন ডলার গ্রহণে বাধ্য করা হয়?

সেই সময় মার্কিন কংগ্রেস আইন করে ঘোষণা দেয়, যারা ডলার নিতে অস্বীকার করবে, তারা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী বলে গণ্য হবে। এভাবে মানুষকে জোর করে ডলার গ্রহণে বাধ্য করা হয়।

তখনকার ডলারের মান

তখন ডলার ছিল শুধু একটি কাগজের টুকরা, যার পেছনে আসলে কোনো সোনা ছিল না। এর মান ধরে রাখা হতো কেবল সরকারের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তিতে। বাস্তব অর্থে তখন ডলারের নিজস্ব কোনো মূল্য ছিল না।

মূল্যস্ফীতির সূচনা

১৮৭৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল পরিমাণ মূল্যস্ফীতি (Inflation) দেখা দেয়, আর মার্কিন ডলারের মূল্য অনেকটাই কমে যায়। এরপর সরকার ডলারের পেছনে আবার স্বর্ণের রিজার্ভ যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। যাতে মানুষ চাইলে সবুজ রঙের ডলার দিয়ে স্বর্ণ নিয়ে যেতে পারে। এই ব্যবস্থা চালু হলে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে আসে।

১৯২৯ সালের মহামন্দা (The Great Depression)

১৯২৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বে এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়, যা কয়েক বছর ধরে চলেছিল। এই পরিস্থিতিতে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ১৯৩৩ সালে ডলারের পেছনের স্বর্ণের রিজার্ভ সিস্টেম তুলে দেন। অর্থাৎ ডলারের স্বর্ণভিত্তিক মূল্য বাতিল করে দেন।

পরের বছর ১৯৩৪ সালে তিনি আবার ডলারের পেছনে স্বর্ণ যুক্ত করেন, তবে এবার আগের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন মূল্যে তিনি এ কাজটি করেন। যাতে করে অর্থনৈতিক সংকট থেকে দেশকে কিছুটা বের করে আনা যায়।

এই ব্যবস্থা ততদিন চলতে থাকে, যতদিন না ১৯৪৪ সালে 'ব্রেটন উডস চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়, যেটি আধুনিক ডলারের আন্তর্জাতিক ভূমিকার ভিত্তি তৈরি করে দেয়।

ব্রেটন উডস চুক্তি কী? এর গুরুত্ব কী ছিল?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। যুদ্ধ শেষ হওয়ার এক বছর আগেই ১৯৪৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র নতুন এক বিশ্বব্যবস্থা গঠনের উদ্যোগ নেয়, বিশেষ করে একটি নতুন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামো, যার শীর্ষে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র নিজে ও মার্কিন ডলার। আর এ লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক Bretton Woods চুক্তি।

চুক্তির বিবরণ

এই চুক্তিতে অংশ নেয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ৪৪টি দেশ, যারা ২২ দিনেরও বেশি সময় ধরে সম্মেলনে উপস্থিত থাকে। এ সময় তারা বহু আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে, যার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববাণিজ্যকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে চালানো এবং কিছু শর্ত ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা।

সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

এই সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ছিল, মার্কিন ডলারকে বৈশ্বিক মুদ্রার মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করা। অর্থাৎ বিশ্বের অন্যান্য মুদ্রার মান ঠিক হবে ডলারের ভিত্তিতে।

এটাই ছিল সেই গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি, যার মাধ্যমে গঠিত হয় :

- বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা (Foreign Exchange System)।
- আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)।
- বিশ্বব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development)।

এই সিদ্ধান্তের ফলে মার্কিন ডলার হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু আর যুক্তরাষ্ট্র হয়ে ওঠে বিশ্ব অর্থনীতির নেতৃত্বদানকারী শক্তি।

কেন ডলার বিশ্বমুদ্রা হয়ে উঠল?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ছিল সারা বিশ্বের ৭৫% স্বর্ণের রিজার্ভ। এ ছাড়া মার্কিন ডলারই তখন একমাত্র মুদ্রা ছিল, যার পেছনে স্বর্ণের রিজার্ভ সংরক্ষিত ছিল। অন্যসব দেশ নিজেদের মুদ্রার স্বর্ণভিত্তিক মান বাতিল করে দিয়েছিল মূল্যস্ফীতির কারণে।

ফলে বিশ্বের অনেক দেশ মার্কিন ডলার জমা করতে শুরু করে, যাতে তারা ভবিষ্যতে ডলার দিয়ে স্বর্ণ নিতে পারে।

এভাবেই ডলার হয়ে ওঠে অনেক দেশের রিজার্ভ মুদ্রা (foreign reserve currency)। তখন থেকেই বিভিন্ন দেশ নিজেদের বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণে ডলারকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে থাকে।

এইভাবেই 'আঙ্কেল স্যাম' তথা আমেরিকা সফলভাবে বৈশ্বিক অর্থনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে আর ডলার হয়ে ওঠে একচ্ছত্র আধিপত্যের প্রতীক। তবে এরপর ঘটেছিল একটি বড় পরিবর্তন, যা এই চুক্তির ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল...।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ, নিক্সন শক এবং ডলারের স্বর্ণমুদ্রা-সমর্থন বাতিল

১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ চালানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল পরিমাণ ডলারের প্রয়োজন ছিল।[৩] কিন্তু মজুদ থাকা ডলার যথেষ্ট ছিল না। কারণ যুক্তরাষ্ট্রে (বরং

---

৩. ভিয়েতনাম যুদ্ধের কারণসমূহ :

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ভিয়েতনাম ছিল জাপানি বাহিনীর দখলে। সে সময় এ অঞ্চলকে বলা হতো 'ইন্দোচীন'। যুদ্ধের শেষ প্রান্তে এবং জাপানের সামরিক পরাজয়ের সাথে সাথে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি রাজধানী হ্যানয় দখল করে নেয় এবং ভিয়েতনামের সম্রাটকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করে।

এ সুযোগে ফ্রান্স তাদের পুরোনো দখলকৃত ইন্দোচীন অঞ্চল পুনরুদ্ধারের ইচ্ছা পোষণ করে, যেটি জাপান তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। তাই ১৯৪৫ সালে ফ্রান্স দেশটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করে। এর ফলে শুরু হয় ভিয়েতনামীদের (যাদের নেতৃত্বে ছিল কমিউনিস্ট নেতা 'হো চি মিন') ও ফরাসিদের মধ্যে যুদ্ধ। এই সংঘাত চলে টানা আট বছর, যার পর সুইজারল্যান্ডে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তিতে বলা হয়, ভিয়েতনামকে সাময়িকভাবে উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে বিভক্ত রাখা হবে এবং দুই বছর পর গণভোটের মাধ্যমে পুনরায় একীকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সংকটের উদ্ভব :

উত্তর ভিয়েতনামের সরকার ১৯৫৪ সালের স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি মেনে নিয়েছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট প্রভাবের বিস্তারের আশঙ্কা করছিল, তাই তারা দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকারকে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সাইগনে মার্কিন আর্থিক ও সামরিক সাহায্যের ধারা শুরু হয়, যাতে সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং পরিস্থিতি এমনভাবে গুছিয়ে নেওয়া যায় যে, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের ঐক্য ঠেকানো যায়।

সারা বিশ্বে) থাকা স্বর্ণ মার্কিন ডলারকে পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না। ফলে যুক্তরাষ্ট্র 'অনুমোদিত সর্বোচ্চ' সীমার চেয়েও বেশি ডলার ছাপিয়ে ফেলে। আর স্বাভাবিকভাবেই ছাপানো সেই ডলারের পেছনে কোনো স্বর্ণের সমর্থন ছিল না। তারা এ কাজটি করে খুবই গোপনে, কাউকে কিছু না জানিয়েই।

নিক্সন শকের নেপথ্যে

এরপর বড় একটি সংকট তৈরি হয় ১৯৭১ সালে, যখন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট 'শার্ল দ্য গোল' (Charles de Gaulle)[৪] ফরাসি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে থাকা আমেরিকান ডলারকে স্বর্ণে রূপান্তর করার দাবি তোলেন। তিনি ১৯১ মিলিয়ন ডলারকে সমমূল্যের স্বর্ণে (তখন এক আউন্স স্বর্ণের দাম ছিল ৩৫ ডলার) রূপান্তরের দাবি করেন, যা Bretton Woods চুক্তি অনুযায়ী সম্পূর্ণ অনুমোদিত ছিল।

অন্যদিকে হ্যানয়ের কমিউনিস্ট সরকার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন থেকে সামরিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং দেশের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক সমর্থন পেতে থাকে। তারা দক্ষিণে কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদের সহায়তা করত, যাতে তারা উত্তর সীমান্ত থেকে মার্কিন উপস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক অভিযান চালাতে পারে। এ কাজের মানে ছিল চুক্তি ও নির্ধারিত সীমারেখা ভঙ্গ করা। এই অবস্থা ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল (এই ধরনের চিত্রনাট্য সব সময়ই এবং এখনো পুনরাবৃত্ত হয়)।

সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি :

দক্ষিণ ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা একটি বিপ্লবী সংগঠন তৈরি করে, যা 'ভিয়েত কং' নামে পরিচিত হয়। ১৯৬০ সালে এই সংগঠনটি জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টে রূপ নেয় এবং একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠনে পরিণত হয়, যার মূল লক্ষ্য ছিল ভিয়েতনামের ভূমিতে মার্কিন উপস্থিতির বিরোধিতা করা এবং পশ্চিমাপন্থি সাইগন সরকারকে উৎখাত করা।

এই পরিস্থিতি দক্ষিণের সরকারকে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে বাধ্য করে। বিশেষ করে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থিত উত্তর ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টকে সমর্থনের ঘোষণা দেয় এবং তাদের বিপ্লবী লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা সরবরাহ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাইগন সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের ঘোষণা দেয় এবং ১৯৬১ সাল থেকে আমেরিকান সেনারা দক্ষিণ ভিয়েতনামে টহল দিতে শুরু করে। ১৯৬৩ সালের মধ্যে মার্কিন অফিসার ও সৈন্য মিলিয়ে সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়ায় ১৬ হাজারেরও বেশিতে। এর পরপরই আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে।

৪. দ্য গোল ছিলেন ইউরোপ ও ফ্রান্সের নায়ক এবং নাৎসিবাদ থেকে মুক্তিদাতা। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। আমেরিকার খেলা তিনি বুঝে ফেলেছিলেন। তাই তিনি আমেরিকাকে ফাঁসাতে এবং তার আসল চেহারা উন্মোচন করতে এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এই কারণে তাকে একাধিকবার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার গলায় 'বিপ্লবের ফাঁস' পরিয়ে দেওয়া হয়, যা শেষ পর্যন্ত তাকে পতনের দিকে নিয়ে যায়।

এই দাবির ফলে যুক্তরাষ্ট্র ধীরে ধীরে ডলারকে স্বর্ণে রূপান্তর করার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। শেষমেশ ১৯৭৩ সালে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন একটি বিবৃতি জারি করে ঘোষণা দেন যে, যুক্তরাষ্ট্র আর আমেরিকান ডলারকে স্বর্ণে রূপান্তরের বাধ্যবাধকতা পালন করবে না। এই ঘোষণাই পরবর্তীকালে নিক্সন শক (Nixon Shock) নামে পরিচিত হয়।

মূল্যহীন কাগজ যেভাবে 'স্বর্ণ' হয়ে ওঠে

এরপর স্বর্ণ পুরোপুরি মুক্ত হয়ে যায়। তার দাম-ভাগ্য নির্ধারণ করতে থাকে কেবল বাজারের চাহিদা ও জোগান। ডলারসহ পৃথিবীর সব মুদ্রা তখন একই অবস্থানে চলে আসে। সবই হয়ে যায় কাগুজে বাধ্যতামূলক মুদ্রা, প্রকৃতপক্ষে যার কোনো অন্তর্নিহিত মূল্য নেই, কেবল সরকারগুলোর ঘোষণার ওপরই তা দাঁড়িয়ে থাকে। ১৯৭৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ডলারের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে প্রায় ৪০ গুণ, আর সোনার দাম বেড়েছে ভয়াবহ মাত্রায়!

এটি ছিল গোটা বিশ্বের জন্য এক চরম ধাক্কা, এক বড় প্রতারণা! বহু বছর ধরে বিভিন্ন দেশ যে মার্কিন ডলার জমিয়ে রেখেছিল বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে, ভেবে রেখেছিল প্রয়োজনে তা সোনায় বদলে নেবে, সেই সুযোগ হঠাৎ করেই হারিয়ে গেল। সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হলো, এত কিছু জানার পরও তারা ডলারের ওপর নির্ভরশীলই থেকে গেল। কারণ রিজার্ভে জমা থাকা বিপুল পরিমাণ ডলার এক ঝটকায় ফেলে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তা করলে সবই পানিতে ভেসে যেত।

আপনি হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন :

তাহলে এসব দেশ ডলারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে লেনদেন বন্ধ করে না কেন?

এর উত্তর হলো, আমেরিকার নৌবাহিনী সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু বাতাস পাহারা দেওয়ার জন্য নয়! মূলত সামরিক শক্তিই অর্থনৈতিক শক্তিকে রক্ষা করে।

এভাবেই ডলার হয়ে ওঠে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ, অন্য সকল দেশ যা ব্যবহার করতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, অন্যান্য মুদ্রার মানও নির্ধারণ হয় ডলারের ভিত্তিতে। ফলে বিশ্ব-অর্থনীতির ওপর আমেরিকার আধিপত্য আরও মজবুত হয়ে যায়।

পেট্রোডলার ধারণা (Petro Dollar)

কালের পরিক্রমায় এই অপরাধীদের জন্য একটি স্বর্ণসদৃশ সুযোগ তৈরি হয়, যা আজও চলমান। সেই সুযোগ হলো, ডলারের মানকে তেলের দামের সঙ্গে সংযুক্ত করা। বিশেষ করে আরব দেশগুলোর তেল রপ্তানির বিনিময়ে তাদের নিরাপত্তা দেওয়া, যাতে তারা যেকোনো হুমকি থেকে সুরক্ষিত থাকে। ফলে বিশ্ব আবারও ডলারের আধিপত্যের অধীনে চলে আসে, যে ডলার তৈরি ও ছাপানো হয় মাত্র কয়েকজন চোরের হাতে।[৫]

নিচে এই চোরদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো, যা লিখেছেন একজন চীনা-আমেরিকান সম্পাদক, যিনি 'Currency Wars' বইয়ের লেখক। বইটি এক মিলিয়ন পঞ্চাশ হাজার কপি বিক্রি হয়েছে!

---

৫. **পেট্রোডলারের ইতিহাস :** ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় সৌদি আরবের নেতৃত্বে তেল উৎপাদনকারী রাষ্ট্রগুলো আমেরিকার ওপর তেল-অবরোধ শুরু করে। তখন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে সৌদি আরবকে এই অবরোধ শেষ করতে রাজি করান। একই সঙ্গে সৌদি আরব সিদ্ধান্ত নেয়, এরপর থেকে তেল বিক্রির জন্য শুধুমাত্র ডলার ব্যবহার হবে। এর বিনিময়ে আমেরিকা প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যেকোনো বিপদ, অভ্যুত্থান বা যুদ্ধে তারা সৌদি রাজপরিবারকে রক্ষা করবে। বাস্তবে আমেরিকা এটি প্রমাণ করেছিল ১৯৯০ সালের প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে। কিসিঞ্জারের প্রচেষ্টায় অন্যান্য উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্র এবং পরে সব ওপেকভুক্ত (OPEC) দেশও ডলারে তেল বিক্রি শুরু করে। ফলে তেলকে কেন্দ্র করে ডলার বিশ্বের প্রধান রিজার্ভ কারেন্সি হয়ে ওঠে। বিশ্ব অর্থনীতি ডলারের ওপর নির্ভরশীল হয় এবং ডলার হয়ে ওঠে শক্তিশালী একক মুদ্রা। এটিকেই বলা হয় পেট্রোডলার চুক্তি।
ডলারের ওপর এই নির্ভরশীলতা আমেরিকাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে দেয়। তারা নিজের ইচ্ছামতো বিভিন্ন দেশের ওপর অবরোধ আরোপ করে, ফরেন রিজার্ভ ফ্রিজ করে এবং সুইফট সিস্টেম থেকে দেশকে বের করে দেয়। ফলস্বরূপ, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনেক দেশ ডলারের ওপর নির্ভরতা কমানোর চেষ্টা করছে। ইউরো ও চীনের ইউয়ানও এখন বেশকিছু তেল-লেনদেনে ব্যবহার হচ্ছে।

রথসচাইল্ড পরিবার ও বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের গল্প

যখন মার্কিন ডলারের মান ইউরোর তুলনায় কমতে থাকে, আর তেল ও সোনার দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন সন্দেহ আরও বেড়ে যায়।

এসব আলোচনা উঠে এসেছে 'Currency Wars' গ্রন্থে, যা রচনা করেছেন চীনা-উৎপত্তির মার্কিন গবেষক 'সং হংবিং'। বইটিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, ইহুদিবাদী ষড়যন্ত্র, অর্থাৎ ইহুদি মালিকানাধীন বড় ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতি পরিচালনা করা হচ্ছে এবং এটি চীনের অর্থনৈতিক 'মিরাকল' ধ্বংসের জন্য একটি ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে।

বইটি প্রকাশের পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন ইহুদি সংস্থা লেখককে আক্রমণ করে এবং তাকে ইহুদিবিরোধী (Anti-Semitic) হিসেবে অভিযুক্ত করে। কারণ তিনি সতর্ক করেছিলেন যে, চীনের অবিশ্বাস্য অর্থনৈতিক অর্জন, যাকে তিনি 'চীনা অর্থনৈতিক মিরাকল' বলে অভিহিত করেছেন, তা বড় বড় ব্যাংকগুলো দ্বারা সাজানো ষড়যন্ত্রের কারণে ভবিষ্যতে ধ্বংস ও পতনের মুখে পড়তে পারে, যেগুলো ১৯শ শতক থেকে ইহুদিদের মালিকানাধীন।

রথসচাইল্ড পরিবার তখন বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জন করে। ছয় বিলিয়ন ডলারেরও বেশি, যা আজকের দিনে এই সংখ্যার কয়েকশ গুণ সমতুল্য!

হংবিং-এর মতে, ডলারের পতন এবং তেল ও সোনার দাম বৃদ্ধি হলো সেই গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, যা রথসচাইল্ড পরিবার চীনের অর্থনীতিতে আঘাত হানতে

ব্যবহার করতে পারে। এই অনুমান ও বিশ্লেষণের কারণে তার বই প্রকাশের পর থেকে নজিরবিহীন বিক্রির রেকর্ড গড়ে তোলে।

ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা সম্পন্ন

হংবিং-এর সমালোচকরা তার ব্যাপারে অভিযোগ তুলেছে যে, হংবিং ইহুদিদের মাধ্যমে বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ষড়যন্ত্র-তত্ত্বের 'কাল্পনিক' ঝোঁক রাখেন। তবে হংবিং বিশ্বাস করেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রথসচাইল্ড পরিবার ইতিমধ্যেই চীনের অর্থনীতিতে আঘাত হানার পরিকল্পনা সম্পন্ন করে ফেলেছে। যা এখনো অজানা তা হলো, এই আঘাত কখন কার্যকর করা হবে?

বিশেষত যদি চীনে শেয়ারবাজার ও রিয়েল এস্টেটের দাম অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পায়, এবং বিপুল পরিমাণ রিজার্ভ জমা থাকে, তখন 'উপযুক্ত পরিস্থিতি' তৈরি হবে। হংবিং তাই চীনকে আহ্বান করেছেন ডলার রিজার্ভের বড় অংশ দিয়ে স্বর্ণ কিনে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা নিতে। কারণ স্বর্ণই একমাত্র উপাদান, যা মুদ্রার মূল্যপতন প্রতিরোধ করতে পারে।

হংবিং চীনা জনগণের প্রতি সতর্কতা জানিয়ে বলেন, যখন শেয়ারবাজার ও রিয়েল এস্টেটের দাম অত্যধিক উচ্চতায় পৌঁছে যাবে, তখন এক রাতেই বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করে দিতে পারবে। তারা কেবল তাদের বিনিয়োগ তুলে নিয়েই এ আয়োজন করতে সক্ষম হবে। এতে চীনের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তারা সেই ক্ষতির সুযোগে অসীম মুনাফা অর্জন করবে।

যদিও চীন চেষ্টা করছে বিদেশি মূলধনের প্রবাহ সীমিত করতে, তবে চীনা কর্তৃপক্ষ পশ্চিমা পরামর্শে তাদের আর্থিক ব্যবস্থা উন্মুক্ত করা এবং মুদ্রা ভাসমান[৬] করার প্রতি গভীর সন্দেহ পোষণ করে। তাদের বিশ্বাস, এটি উন্নয়নশীল দেশগুলোর সম্পদ লুটের নতুন উপায় হতে পারে।

তবে গ্রন্থটিতে প্রকাশিত হয়েছে, বেইজিং সরকার যা কল্পনা করে, তা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। কোটি কোটি ডলার বাজারে প্রবেশ করছে

৬. বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও জোগানের ওপর ভিত্তি করে মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রিত হওয়াই হলো ভাসমান মুদ্রা।

হংকং ও শেনঝেনের পথ ধরে, যা চীনের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে প্রবাহিত হচ্ছে।

লেখকের মতে, চীনের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো এবং হংকং-এর ১৯৯৭ সালের বৃহৎ অর্থনৈতিক সংকটের আগের অবস্থার মতো। তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেসব ষড়যন্ত্র, যা সোভিয়েত ইউনিয়নকে পতনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেছেন, এই বিশাল শক্তির ভাঙন কোনো দুর্ঘটনা বা আকস্মিক ঘটনা ছিল না, বরং এটি রথসচাইল্ড পরিবার এবং তাদের সহযোগীদের পরিকল্পিত ও সুক্ষ্মভাবে সাজানো ষড়যন্ত্রের ফলাফল।

রথসচাইল্ড পরিবারের ক্ষমতা দখলের সূচনা

সং হংবিং-এর মতে, মূলত কারেন্সি ওয়ার বা মুদ্রাযুদ্ধের সূচনা ঘটে রথসচাইল্ড ইহুদি পরিবারের হাত ধরে ১৮১৫ সালের ১৮ জুনে, ঠিক 'ওয়াটারলু' যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে। যে যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনী ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সেনাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ করে।

তিনি স্পষ্ট করে বলেন, রথসচাইল্ড পরিবারের তৃতীয় পুত্র নাথান রথসচাইল্ড ব্রিটিশদের আসন্ন জয়ের খবর আগেভাগেই জানতে পেরে এক চতুর পরিকল্পনা করে। সে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুয়া খবর ছড়িয়ে দেয়, নেপোলিয়নের বাহিনী জয়লাভ করেছে! এই সংবাদ ব্রিটিশ সরকার নিজে জয়ের খবর পাওয়ার ২৪ ঘণ্টা আগেই বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হয়!

ফলাফল? লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ মুহূর্তেই ভেঙে পড়ে এবং শেয়ারের দাম নামতে নামতে তলানিতে পৌঁছে যায়। এই সুযোগে রথসচাইল্ড পরিবার অতি সস্তায় বাজারের প্রায় সব শেয়ার কিনে ফেলে। পরে আসল জয়ের খবর প্রকাশিত হলে শেয়ারের দাম আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে। আর সেই সময়টাতেই রথসচাইল্ড পরিবারের হাতে জমে যায় অগাধ সম্পদ ও আর্থিক ক্ষমতার লাগাম।[৭]

---

৭. এখান থেকেই আমরা তথ্যের প্রকৃত মূল্য অনুমান করতে পারি। তবে তথ্যের মূল্য তখনই কাজে আসে যখন আপনি সেটি ব্যবহার করে বিনিয়োগ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমেরিকানরা আজও গবেষণাকেন্দ্রগুলোতে বিনিয়োগ করে ঠিক এই ধরনের কৌশলগত তথ্য ব্যবহারের উপায় খুঁজছে। যেমন : কীভাবে ইংল্যান্ডের নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিজয়ের ভুয়া তথ্য

ব্যবহার করে রথসচাইল্ড পরিবার তাদের চতুর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছিল?

যখন আমরা অতুলনীয় বুদ্ধিমত্তা, বিরাট ধনসম্পদ এবং পরম ক্ষমতা একসাথে দেখতে চাই, তখন আমরা মূলত বোঝাই রথসচাইল্ড ইহুদি পরিবারকে। এটি এমন একটি পরিবার, যারা সব নিয়ম-নীতি ও আইন অতিক্রম করে পৃথিবীর ক্ষমতা দখল করেছে এবং সেটি মজবুতভাবে ধরে রেখেছে।

তাহলে রথসচাইল্ড পরিবার কারা?

এটি একটি জার্মান ইহুদি বংশোদ্ভূত পরিবার, যার খ্যাতি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে আছে তাদের বিশাল ক্ষমতা ও অভূতপূর্ব ধনসম্পদের কারণে। বাস্তবিক অর্থে তারা পৃথিবীর অর্ধেক সম্পদের মালিক। সংখ্যা হিসেবে বললে, তাদের সম্পদের মূল্য প্রায় ৫০০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান!

পরিবারের নামটি এসেছে 'রথসচাইল্ড' নামের একটি বাড়ি থেকে, যা ১৫৬৭ সালে আইজ্যাক এলচানান বাখারাখ (Isaak Elchanan Bacharach) জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে নির্মাণ করেন। পরিবারটির প্রতিষ্ঠাতাও তিনিই। রথসচাইল্ড নামের অর্থ হলো লাল ঢাল বা রেড শিল্ড (Red Shield)। আইজ্যাক এলচানানের বানানো প্রাসাদটির দরজায় একটি লাল ঢাল ছিল। সেই 'রেড শিল্ড' থেকেই পরবর্তীকালে রথসচাইল্ড নামটির জন্ম হয়।

এটি ছিল রথসচাইল্ড পরিবারের সম্পদ বাড়ানোর চতুর কৌশল। তাদের কাছে যুদ্ধ মানেই ছিল লাভজনক ব্যবসা এবং সফল বিনিয়োগ। যেমনটি দেখা গিয়েছিল ওয়াটারলু যুদ্ধের সময়। যুদ্ধটি ইংল্যান্ডের জয় দিয়ে শেষ হয়েছিল। তবে অবিশ্বাস্যভাবে ইংল্যান্ড শাখার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে রথসচাইল্ড পরিবার বিজয়ের খবর পেয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ডের অন্য সবার আগে!

তৎকালীন ব্যাংক শাখার মালিক নাথান রথসচাইল্ড একটি বিরাট ট্রাঙ্কে তার বন্ড এবং রিয়েল এস্টেট নিয়ে লন্ডনের স্টক এক্সচেঞ্জের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। তার পরনে ছিল জীর্ণ-পুরোনো পোশাক। এক্সচেঞ্জ খোলার সাথে সাথে সে ঢুকে নিজের সব বন্ড ও সম্পত্তি বিক্রি করে দেয়।

সবার জানা ছিল, নাথানের তথ্য-নেটওয়ার্ক বেশ শক্তিশালী। তাই তারা ভেবেছিল, ইংল্যান্ড সত্যিই হেরে গেছে। ফলে তার দেখাদেখি সবাই তৎক্ষণাৎ তাদের বন্ড ও সম্পত্তি বিক্রি করতে শুরু করে। নাথান তখন তার গোপন ক্লায়েন্টদের মাধ্যমে এসব বন্ড ও রিয়েল এস্টেট খুব সস্তায় কিনে নেয়। দুপুরের মধ্যে যখন ইংল্যান্ডের বিজয়ের খবর এল, দাম আবার বাড়তে শুরু করল। তখন নাথান যা কিনেছিল, তা বিক্রি করে সীমাহীন লাভ অর্জন করে নেয়।

তাহলে আমাদের আসল ঘাটতি কি তথ্য খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে, না-কি সমস্যা লুকিয়ে আছে সেই তথ্য কাজে লাগানোর অক্ষমতায়?

মানসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে স্পষ্ট হয়ে যায়, আরবদের মধ্যে একে অপরের প্রতি সম্মানের অভাব গভীরভাবে প্রোথিত আছে। ফলে অন্যের কাছ থেকে আসা যেকোনো তথ্য বা উপকারিতা প্রায়ই অবহেলায় উপেক্ষিত হয়, যেন সেগুলো উদাসীন কানের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কোনো হাওয়া। আমরা একে অপরকে যেভাবে শ্রেণিবদ্ধ করি, তাতেই মানসিক গ্রহণক্ষমতার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ব্যক্তিগত কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়নগুলো দাঁড়িয়ে থাকে নানা ধরনের মনস্তাত্ত্বিক রোগের শেকড়ে। ফলে বাস্তবে দেখা যায়, আপনি কোনো মানুষকে এমন এক ধারণা উপহার দিলেন, যা তার ব্যবসা বা প্রকল্পকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিতে পারে; তবুও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে সেই ভাবনাটিকে গুরুত্ব দেবে না। এমনকি সে তার জন্য প্রচেষ্টা করবে না, বা সামান্য অর্থ দিয়েও তা কিনতে রাজি হবে না।

সং হংবিং নাথান রথসচাইল্ডের একটি বিখ্যাত উক্তি উল্লেখ করেছেন। ব্রিটেনের সম্পদ ও অর্থনীতির ওপর রথসচাইল্ড পরিবারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর নাথান বলেছিল, ব্রিটেনের সিংহাসনে কে বসে আছে এ নিয়ে আমার আর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। কারণ আমরা যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থ ও সম্পদের উৎসের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছি, তখন কার্যত রাজকীয় ক্ষমতাকেও আমরা বশীভূত করে ফেলেছি। কারণ অর্থের ক্ষমতা এখন আমাদের হাতে।

এই বিপুল লাভ রথসচাইল্ড পরিবারকে লন্ডনের কেবল একটি সমৃদ্ধ ব্যাংকের মালিকানা থেকে তুলে নিয়ে এমন এক সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করল, যার আর্থিক লেনদেন ও ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হলো প্যারিস থেকে শুরু করে ভিয়েনা, নাপোলি এবং শেষ পর্যন্ত বার্লিন ও ব্রাসেলস পর্যন্ত।

লেখক উল্লেখ করেছেন, কীভাবে ১৮১৮ সালে পরিবারের বড় ছেলে জেমস রথসচাইল্ড পরিবারের সম্পদ বৃদ্ধি করে ফরাসি জাতীয় কোষাগারের সমান প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।

ওয়াটারলু যুদ্ধের পর ফ্রান্সের নতুন রাজা লুই অষ্টাদশ তার দেশে রথসচাইল্ড পরিবারের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ঠেকানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু জেমস পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে ফরাসি কোষাগারের বিরুদ্ধে স্পেকুলেটিভ এটাক বা অর্থনৈতিক ষড়যন্ত্র চালায়, যা ফরাসি অর্থনীতিকে প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়।

পরিস্থিতি যখন প্রায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন রাজা লুইয়ের সামনে একমাত্র পথ ছিল জেমস রথসচাইল্ডের সাহায্য প্রার্থনা করা। জেমস সাহায্যের

বস্তুত আমরা এমন জাতি, যারা বিনামূল্যে ভোগ করতে ভালোবাসি। খাওয়া, পান করা, বসবাস করা, বিয়ে করা, হজ পালন করা, ঘর বানানো ইত্যাদি থেকে নিয়ে মৃত্যু ও দাফন পর্যন্ত যেন বিনা খরচে হয়ে যায়, আমরা সে চিন্তায় ডুবে থাকি।

একটি বড় আন্তর্জাতিক কোম্পানি তাদের ব্যবসায় বিপ্লব ঘটিয়েছিল বহু বছর আগে একটি ছোট, কিন্তু মূল্যবান 'তথ্য' কিনে। এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাদের সেই ধারণাটি দিয়েছিলেন সামান্য টাকার বিনিময়ে। ধারণাটি ছিল, তাদের গ্যাসযুক্ত পানীয় ব্যারেলে ভরে নিজস্ব দোকান থেকে বিক্রি না করে কাচের বোতলে ভরে বাজারের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে দেওয়া।

এই সাধারণ, কিন্তু যুগান্তকারী তথ্যের মূল্যকে তারা সম্মান জানিয়েছিল। এর ফলেই কোম্পানিটির মুনাফা আকাশ ছুঁয়ে যায়। আজ আপনি শুধু জেনে নিন, পেপসি বা কোকাকোলার মতো কোম্পানিগুলোর বাজারমূল্য কত, তাহলেই বুঝবেন, একটি সঠিক ধারণা কীভাবে বিশ্বব্যাপী সম্পদের সিঁড়ি তৈরি করতে পারে।

হাত বাড়িয়ে দেয় বটে, কিন্তু এর বিনিময়ে সে ফরাসি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিপুল পরিমাণ বন্ড এবং রিজার্ভের একটি বড় অংশের ওপর দখল নিয়ে নেয়। অর্থাৎ অমূল্য দাম দিয়ে কেনা এক 'সহায়তা'।

এভাবে ১৮১৫ থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে রথসচাইল্ড পরিবার ব্রিটেন ও ফ্রান্স থেকে ছয় বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সম্পদ আহরণে সক্ষম হয়। লেখকের মতে, এর ফলে তারা বিশ্বের বিভিন্ন মুদ্রায় অগণিত বিলিয়নের পাহাড় গড়ে তোলে। তখন তাদের সামনে বাকি ছিল কেবল আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে আমেরিকায় পৌঁছানো, যে দেশটি বিশ শতকে বিশ্বের সর্বোচ্চ পরাশক্তি হওয়ার যাবতীয় উপাদান ধারণ করে রেখেছিল।

এরপর রথসচাইল্ড পরিবার, সঙ্গে আরও কয়েকটি অতি-ধনী ইহুদি পরিবার উপলব্ধি করে, বিশ্বের ওপর আধিপত্য বিস্তারের আসল লড়াই মূলত যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ-দখলে। তখন শুরু হয় আরেকটি পরিকল্পনা, যা পূর্বের চেয়েও জটিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যার লক্ষ্য পূরণ হয়েছিল।

গল্পের নতুন মোড় : ফেডারেল রিজার্ভ

১৯১৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় আসে। সেদিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson) আইন পাস করেন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ফেডারেল রিজার্ভ' গঠনের জন্য। এই আইন ছিল সেই প্রথম স্ফুলিঙ্গ, যা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে অর্থ ও ইহুদিদের প্রভাবাধীন ব্যাংকার শ্রেণির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এর পেছনে ছিল টানা এক শতাব্দী ধরে চলা রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আর্থিক অভিজাতদের (যাদের ওপর ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণ ছিল) মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ।

Currency wars গ্রন্থে এই দীর্ঘ আর্থিক যুদ্ধের পটভূমি বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতিদের সঙ্গে ইহুদিদের দখলে থাকা ব্যাংক ও আর্থিক গোষ্ঠীর নিরন্তর লড়াই শেষে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অবশেষে রথসচাইল্ড সাম্রাজ্য ও তার সহযোগীদের কব্জায় চলে যায়।

বইটিতে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের কথা, যিনি একাধিকবার সতর্ক করেছিলেন, তিনি দুই শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন।

- প্রথমটি অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক, দক্ষিণের বাহিনী।
- দ্বিতীয়টি হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ংকর সেই ব্যাংকারগোষ্ঠী, যারা প্রয়োজনে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করতেও দ্বিধা করে না।

অর্থযুদ্ধে মৃত্যুর মিছিল

সং হংবিং বলেন, এই অর্থনৈতিক যুদ্ধের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছয় জন প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেসের আরও কয়েকজন সদস্য নিহত হয়েছিলেন।[৮]

প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম হ্যারিসন (William Henry Harrison), যিনি ১৮৪১ সালে নির্বাচিত হন, তিনি ছিলেন এই যুদ্ধের প্রথম শিকার। দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র এক মাসের মাথায় তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার মৃত্যুর কারণ ছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আর্থিক গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব বিস্তারের বিরোধিতা করা।

প্রেসিডেন্ট জ্যাকারি টেইলারও (Zachary Taylor) রহস্যজনকভাবে মারা যান। তার মৃত্যুর ১৫০ বছর পর (১৯৯১ সালে) তার সমাধি থেকে নেওয়া চুলের নমুনা পরীক্ষায় দেখা যায়, তাতে প্রাণঘাতী আর্সেনিক বিষের উপস্থিতি ছিল!

এ ছাড়া এই যুদ্ধেই প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincoln) ১৮৬৫ সালে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। প্রেসিডেন্ট জেমস গারফিল্ডও (James A. Garfield) গুলিবিদ্ধ হন এবং পরবর্তী সময়ে ক্ষতস্থানে সংক্রমণ হওয়ার কারণে মৃত্যুবরণ করেন।

আগুনের জ্বলে ওঠা ছাই

মার্কিন প্রেসিডেন্টদের মধ্যে যিনি ব্যাংকারদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছেন বলে ধারণা করা হয়, তিনি হলেন অ্যান্ড্রু জ্যাকসন (Andrew Jackson)।[৯] তিনি দুইবার

---

৮. প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি (John F. Kennedy) হত্যার পেছনে কী কারণ ছিল, তা নিয়ে বিভিন্ন কথা প্রচলিত আছে। তবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী এটি ঘটেছিল 'Executive Order ১১১১০' পাসের কারণে। এই নির্বাহী আদেশের মূল কথা ছিল, মার্কিন ডলারের নোট শুধুমাত্র সরকারই ছাপতে পারবে। এই আইন প্রেসিডেন্টকে ব্যাংকের শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে বলে মনে করা হয়। এজন্যই তাকে ব্যাংকের পক্ষ থেকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

৯. ক্ষমতার সময়কাল : ১৮২৯–১৮৩৭

ভেটো ব্যবহার করে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা রুখে দেন। আমেরিকান জনগণের কাছে তার জনপ্রিয়তা ও দৃঢ় ব্যক্তিত্ব তাকে এই লড়াইয়ে সহায়তা করেছিল।

মৃত্যুর আগে জ্যাকসন বলে গিয়েছিলেন, তার সমাধিতে যেন নিম্নোক্ত বাক্যটি লেখা হয়, 'আমি ব্যাংকার লর্ডদের হত্যা করতে পেরেছি, যদিও তারা আমাকে সরিয়ে দিতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে।'

তবে এই সাময়িক সাফল্য রথসচাইল্ড পরিবার ও তাদের সহযোগীদের আর্থিক খাত (এর মধ্যে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকও অন্তর্ভুক্ত) নিয়ন্ত্রণে নেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

পরবর্তীকালে কিছু চীনা সংবাদমাধ্যম এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে সাবেক ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ারম্যান পল ভলকারের (Paul Volcker) সাক্ষাৎকার নেয়। তিনি স্বীকার করেন, মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক পুরোপুরি সরকারের মালিকানাধীন নয়। এর মূলধনে বড় বেসরকারি শেয়ারহোল্ডারও রয়েছে। তবে তিনি চীনাদের প্রতি আহ্বান জানান, এ বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে তারা যেন কোনো রায়ে না পৌঁছায়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক না-কি ইহুদি ব্যাংক?

এ কথা সবারই জানা যে, মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে 'সরকারি ও বেসরকারি খাতের এক অস্বাভাবিক মিশ্রণ' হিসেবে।

কিন্তু সং হংবিং-এর বক্তব্য আরও স্পষ্ট। তার মতে, এটি আসলে পাঁচটি বড় বেসরকারি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে, যেমন সিটি ব্যাংক। আর এই ব্যাংকগুলো ধনী ইহুদি পরিবারের মালিকানায় রয়েছে, যারা আড়াল থেকে মার্কিন ফেডারেল সরকারকে প্রভাবিত করে। ফলে তাদের হাতে শুধু আমেরিকার নয়, পুরো বিশ্বের অর্থনীতিরও নিয়ন্ত্রণ চলে এসেছে।

কিছু আমেরিকান মহল বইটিকে ইহুদি বিদ্বেষমূলক বলে অভিযুক্ত করেছিল। তাদের যুক্তি ছিল, যদি চীনের অর্থনীতি কখনো ধ্বংস হয়, তার জন্য দায়ী হবে

চীনের মানবাধিকার লঙ্ঘন, স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা এবং তাইওয়ানকে স্বায়ত্তশাসন থেকে বঞ্চিত করা; ইহুদিরা নয়।

তবে সং হংবিং এই অভিযোগকে প্রত্যাখ্যান করে ইহুদিদের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, 'চীনা জনগণ মনে করে ইহুদিরা খুব বুদ্ধিমান, তাই আমাদের তাদের কাছ থেকে শেখা উচিত। আমি নিজেও মনে করি তারা সত্যিই বুদ্ধিমান, এমনকি হয়তো পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান তারাই!'

স্বর্ণ (Gold)

মানবজাতির প্রতি আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ হলো, স্বর্ণ মানুষের হাতে তৈরি করা যায় না এবং স্বর্ণ ছাপানোও যায় না। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য প্রচেষ্টা হয়েছে বিভিন্ন উপাদান মিশিয়ে কৃত্রিমভাবে স্বর্ণ উৎপাদনের; কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়েছে। অতীতে এই ব্যর্থ প্রচেষ্টার বিদ্যাকে বলা হতো ইলমুস সিমিয়া, যা আজকের দিনে ইলমুল কিমিয়া (রসায়নবিদ্যা) নামে পরিচিত।

স্বর্ণ কেবল সৃষ্টি হয় মহাবিশ্বের বিরাট নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণ 'সুপারনোভা'[১০] থেকে, যা সংঘটিত হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট মহাজাগতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

১০. জ্যোতির্বিজ্ঞানে সুপারনোভা বলতে বোঝায় একটি নক্ষত্রের মৃত্যুর সময় ঘটে যাওয়া প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। যখন কোনো বৃহৎ নক্ষত্র তার জ্বালানি শেষ করে ফেলে, তখন তার অভ্যন্তরের মহাকর্ষীয় চাপ ও শক্তির ভারসাম্য ভেঙে গিয়ে বিশাল বিস্ফোরণ ঘটে। এতে নক্ষত্রের বাইরের স্তর মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং অস্থায়ীভাবে সেই নক্ষত্র সূর্যের থেকেও কোটি গুণ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সুপারনোভা মহাবিশ্বে নতুন ভারী মৌল তৈরির অন্যতম প্রধান উৎস।

মুদ্রা ও অর্থ

অতীতে যখন মানুষের কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের প্রয়োজন হতো, তখন সে তা অন্য কারও কাছ থেকে গ্রহণ করত; বিনিময়ে নিজের কোনো পণ্য তাকে দিয়ে দিত। এ ব্যবস্থাটি পরিচিত ছিল 'বিনিময়-পদ্ধতি' নামে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই পদ্ধতিটি অকার্যকর হয়ে ওঠে। কারণ অনেক সময় একজন মানুষের কোনো পণ্যের প্রয়োজন হলেও অপর পক্ষের কাছে এমন কোনো পণ্য না-ও থাকতে পারে, যা বিনিময়যোগ্য।

অর্থনীতিবিদরা তখন পণ্যের বিনিময়ে নতুন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। অবশেষে তারা এমন একটি পণ্যের কথা চিন্তা করেন, যা প্রতিটি সমাজে সবার জন্য সহজলভ্য এবং যাকে বাকি সকল পণ্যের জন্য মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এ ব্যবস্থাটিকে বলা হয় 'হিসাবি মুদ্রা' বা অ্যাকাউন্টিং কারেন্সি। প্রাচীন সমাজে গবাদিপশু ছিল সবার কাছে সহজলভ্য এবং মূল্যবান, তাই অর্থনীতিবিদরা সেটিকেই বেছে নেন।

এ কারণেই ভারতের মুদ্রার নাম রুপি (RUPEE)। কারণ এই শব্দটির উৎস হলো রুপা (RUPAA), যার অর্থ 'পশু'। একইভাবে আরবি 'নকদ' (نقد) শব্দটির উৎস হলো প্রাচীন আরবদের ব্যবহৃত 'নকদি', যা এক বিশেষ প্রজাতির খাটো পায়ের ভেড়াকে বোঝাত।

সময়ের সাথে সাথে এবং বিভিন্ন সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে মানুষ হিসাবি মুদ্রাকে আরও সহজে ব্যবহারযোগ্য করার চেষ্টা করতে থাকল। এজন্য তারা ধাতুর দিকে ঝুঁকল। প্রথমে এক ধাতু, পরে আরেক ধাতু। এভাবে একপর্যায়ে তারা পৌঁছাল সবচেয়ে মূল্যবান ধাতুর কাছে, স্বর্ণ। কারণ

স্বর্ণের মূল্য অনেক বেশি এবং এটি যেকোনো বিনিময়যোগ্য মুদ্রার তুলনায় স্থিতিশীল।

যে শ্রমিকেরা মুদ্রা তৈরির কাজে নিয়োজিত থাকত, তাদের বলা হতো সায়ারিফা (الصيارفة) বা মানি চেঞ্জারস (money changers)। তারা খুব সাধারণ ও প্রাথমিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে মুদ্রা তৈরি করত। সরঞ্জামগুলোর মধ্যে ছিল একটি ছোট টেবিল, সেখানে তারা নিজেদের জিনিসপত্র রাখত ও কাজ করত।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের লুকোনো রহস্য

বর্তমান বিশ্বে যদি ডলার ধ্বসে পড়ে, তবে যে মুদ্রার সঞ্চয়ই জমিয়ে রাখা হোক না কেন, তা কোনো উপকারে আসবে না। কারণ সব মুদ্রাই ডলারের সঙ্গে যুক্ত। এমনকি স্থাবর সম্পত্তিও (রিয়েল এস্টেট) হয়তো কাজের জিনিস থাকবে না। কারণ তখন কেনাবেচা বন্ধ হয়ে যাবে এবং সবাই অর্থ আঁকড়ে ধরবে।

সম্ভাবনা আছে, তখন কেবল দুটো 'সাদা' জিনিসই টিকে থাকবে, স্বর্ণ ও রুপা। কারণ এগুলোর মূল্য তাদের নিজেদের ভেতরেই নিহিত আছে। এগুলোর দাম বাইরের কোনো কিছুর ওপর নির্ভরশীল নয়। স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল রহস্য এটিই।

এমন অবস্থায় হয়তো আবার মানুষ পণ্য বিনিময়-পদ্ধতিতে ফিরে যাবে। যেমনটি মানুষ প্রথম যুগে স্বর্ণ আবিষ্কারের আগে করত। আল্লাহই ভালো জানেন।

স্বর্ণমুদ্রা চলমান ছিল বেশ দীর্ঘ সময়। তারপর যখন স্বর্ণ বহন করা কষ্টকর হয়ে পড়ল এবং চুরির ভয় তৈরি হলো, তখনই সেখান থেকে ধীরে ধীরে ব্যাংকের ধারণা এল। যেখানে তারা আপনার স্বর্ণ জমা রাখবে এবং এর বিনিময়ে আপনাকে একটি কাগজের রসিদ দেবে, যাতে উল্লেখ থাকবে স্বর্ণের মূল্য। আপনি যখনই চাইবেন, তা দিয়ে স্বর্ণ ফেরত নিতে পারবেন। ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থা এমন স্থানে এসে পৌঁছাল যে, ডলার সবার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে নিল, যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আঙ্কেল স্যামের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা

চলুন পূর্বোল্লিখিত 'ব্রেটন উডস' চুক্তির আলোচনার ধারায় ফিরে যাই আবার। এই চুক্তিতে মিত্রশক্তিরা মিলে সিদ্ধান্ত নেয়, সকল মুদ্রাকে ডলারের সঙ্গে আর

ডলারকে স্বর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। প্রতি ৩৫ ডলার সমান ধরা হবে ২১ ক্যারেটের এক আউন্স খাঁটি স্বর্ণ। পাশাপাশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ধ্বংসপ্রাপ্ত ইউরোপীয় দেশগুলোকে পুনর্গঠন করার জন্য তারা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) প্রতিষ্ঠা করে।

এখানে লক্ষণীয় যে, যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেয় একেবারে শেষের দিকে, যাতে যুদ্ধ থেকে সর্বোচ্চ লাভটুকু তুলতে পারে। বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে, আমেরিকার এই একই চরিত্রটা বারবার আমরা দেখতে পেয়েছি। সে বিশ্বজুড়ে ইচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধ সৃষ্টি করে। তারপর সেই দেশগুলো ধ্বংস হয়ে গেলে পুনর্গঠনের অজুহাত দিয়ে সেখানে প্রবেশ করে সে নিজ স্বার্থ হাসিল করে নেয়। যেমন ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেন ইত্যাদি দেশগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি।

পরে ব্রেটন উডস চুক্তির মিত্র-সমর্থকরা লক্ষ করল, যুক্তরাষ্ট্র অযথা অর্থ অপচয় করছে এবং সামরিক সরঞ্জাম ও যুদ্ধশিল্প ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করছে। এরপরেই তারা ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, যা তাদের বিপুল অর্থ ধ্বংস করে ফেলে। ঠিক তখনই প্রশ্নটা উঠল, এত অর্থ তারা কোত্থেকে পাচ্ছে? সত্যিই কি তাদের কাছে এসব ডলারের জন্য সমপরিমাণ স্বর্ণের মজুদ আছে?

আইন বানিয়ে টাকা চুরির গল্প

আমেরিকা তখন স্বর্ণের সমমূল্যের মজুদ ছাড়াই ডলারের নোট ছাপছিল। ফলে প্রতিটি নতুন ডলার আগের তুলনায় দুর্বল হয়ে পড়ছিল। এটিকেই বলা হয় মুদ্রাস্ফীতি (Inflation)। যার সহজ সংজ্ঞা হলো, স্বর্ণের কোনো বাস্তব ভিত্তি ছাড়াই কাগুজে মুদ্রা ছাপিয়ে বাজারে সরবরাহ বাড়ানো।

এটি আসলে একধরনের 'আইনসম্মত চুরি', যা আইন প্রণয়ন করে বৈধ বানানো হয়েছিল। মিত্রশক্তির দেশগুলো, বিশেষ করে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট শার্ল দ্য গোল এই খেলা বুঝে ফেলেন। তিনি প্রকাশ্যে ডলারের বিরোধিতা করেন এবং তাদের সকল মুদ্রা স্বর্ণে রূপান্তরের দাবি জানান (যেমনটি আগেও উল্লেখ করা হয়েছে)। এর ফলে স্বর্ণের চাহিদা বেড়ে যায় এবং শুরু হয় 'স্বর্ণের জ্বর'।

এই ঘটনার পর বিশ্বস্ত সূত্রে প্রমাণিত হয় যে, দ্য গোলকে হত্যার জন্য একটি ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, যার পেছনে CIA জড়িত ছিল। কিন্তু পরিকল্পনাটি সফল হয়নি।

এরপর ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র ও ব্যাপক গণবিক্ষোভ। ইতিহাসে এটি শিক্ষার্থীদের বিদ্রোহ এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব নামে পরিচিত। মনে রাখবেন, যে বিষয়টিকে তারা 'বিপ্লব' বলে, সেটি আগেও ঘটেছে, ভবিষ্যতে যখন প্রয়োজন হবে, তখনো ঘটবে!

CIA-এর চক্রান্ত ও লন্ডন গোল্ড পুল

ফ্রান্সের সেই বিক্ষোভগুলোর পেছনেও CIA-এর নোংরা হাত ছিল। এর ফলেই দ্য গোল ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান, যদিও তিনিই ছিলেন নাৎসিদের হাত থেকে ফ্রান্সকে মুক্ত করার নায়ক! কিন্তু এ ঘটনা তার জন্য এবং অন্যদের জন্য এক স্পষ্ট বার্তা হয়ে গেল যে, মহাশক্তির প্রভুদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে যেয়ো না।

এরপর জনগণের ক্ষোভ ও আপত্তি প্রশমিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন একসঙ্গে তৈরি করল লন্ডন গোল্ড পুল (London Gold Pool)[১১], যেন মানুষ বিশ্বাস করে ডলার সত্যিই স্বর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জনসাধারণ আসল সত্যটা ধরে ফেলল। উপায় না দেখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ঘোষণা দিলেন, ডলারের সঙ্গে স্বর্ণের সম্পর্ক 'সাময়িকভাবে' বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে।

কিন্তু এই 'সাময়িকভাবে' কথাটি ছিল নিছক প্রতারণা। কারণ সেই বিচ্ছিন্নতা আজ পর্যন্ত বহাল তবিয়তে আছে!

থিঙ্ক ট্যাঙ্কসের ভূমিকা

আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সাফল্যের অন্যতম বড় কারণ হলো রাষ্ট্র ও ব্যক্তির পরিস্থিতি, মানসিক অবস্থা এবং প্রতিটি ঘটনার পটভূমি নিয়ে গভীর গবেষণা করা। এই বিশ্লেষণ তাদের কাছে পৌঁছে দেয় বিশাল ও প্রভাবশালী

---

১১. লন্ডন গোল্ড পুল ছিল আটটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি জোট। যুক্তরাষ্ট্র ও সাতটি ইউরোপীয় দেশ মিলে এটি গঠন করেছিল। ১৯৬১ সালের ১ নভেম্বর তারা একটি চুক্তি করেছিল যার মূল উদ্দেশ্য ছিল :

- ব্রেটন উডস সিস্টেম বজায় রাখা (যেখানে মুদ্রার মান স্থির ও স্বর্ণে রূপান্তরযোগ্য ছিল)।
- স্বর্ণের দাম স্থির রাখা (প্রতি ট্রয় আউন্স স্বর্ণের দাম ৩৫ ডলার হিসেবে)।

এজন্য তারা লন্ডনের স্বর্ণ বাজারে প্রয়োজনমতো হস্তক্ষেপ করত—স্বর্ণ কিনে বা বিক্রি করে দাম নিয়ন্ত্রণ করত। এই ব্যবস্থা ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত চলেছিল, পরে এটি ভেঙে যায়।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো, যেগুলোকে বলা হয় 'থিঙ্ক ট্যাঙ্কস' (Think Tanks)।[১২]

---

১২. থিঙ্ক ট্যাঙ্কস বলতে এমন গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যেগুলো কেবল চিন্তাভাবনার পরিবেশ তৈরি করে না; বরং শূন্য থেকে নতুন ধারণা গড়ে তোলে। সাধারণত এই ধারণাগুলো জন্ম নেয় বিভিন্ন উপাদান ও ঘটনার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার দ্বারা, যতক্ষণ না তা বাস্তবে কার্যকর করার মতো অবস্থায় পৌঁছায়।

এজন্য তারা গবেষণাকেন্দ্র বা 'চিন্তার ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এতে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। তাদের কাজের ধাপগুলো সাধারণত এমন হয় :

১. বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ।
২. সেগুলোর বিশ্লেষণ।
৩. মূল ধারণার বিপরীতে পাল্টা ধারণা তৈরি।
৪. তারপর আবার সেই পাল্টা ধারণারও বিপরীতে আরেকটি ধারণা তৈরি।

এভাবেই প্রতিটি সম্ভাব্য পরিস্থিতির জন্য তাদের হাতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত থাকে।

এ বিষয়ে একটি চমৎকার প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে 'মুআসসাসাতুল ফিকরিল আরাবি'। সেখানে লেবানিজ গবেষক নাসিব শামস (نسيب شمس) থিঙ্ক ট্যাঙ্কস-এর সংজ্ঞা, এর বিভিন্ন ভূমিকা ও দায়িত্ব এবং কীভাবে এগুলো ব্যক্তি, সমাজ ও নীতিনির্ধারকদের ওপর প্রভাব ফেলে, তা বিশদভাবে তুলে ধরেছেন।

নাসিব শামস তার লেখাটি শুরু করেছেন এভাবে, অনেক দিন ধরেই গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংজ্ঞা নির্ধারণ নিয়ে নানা ধরনের জটিলতা ছিল। যদিও 'থিঙ্ক ট্যাঙ্কস' শব্দগুচ্ছটি মূলত ব্যবহৃত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন। তখন এটি দ্বারা একটি নিরাপদ কক্ষ বা অনুকূল পরিবেশ বোঝানো হতো, যেখানে প্রতিরক্ষা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এবং সামরিক পরিকল্পনাবিদরা একত্রিত হয়ে স্ট্রাটেজি ও ট্যাকটিক্স নিয়ে আলোচনা করতেন।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই পরিভাষাটি আরও বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার হতে থাকে। এটি এখন বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যেগুলো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত এবং নীতি-বিশ্লেষণ ও তার বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করে।

লেখক ইঙ্গিত করেছেন যে, থিঙ্ক ট্যাঙ্কস বা গবেষণাকেন্দ্রগুলোর সংজ্ঞা নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলোর সংজ্ঞা এখনো বিতর্কিত, কারণ গবেষণার সঙ্গে যুক্ত অনেক প্রতিষ্ঠানই নিজেদের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বলে স্বীকার করে না; বরং নিজেদেরকে বেসরকারি সংস্থা (NGO) বা অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপস্থাপন করে।

ফলে ধারণাটি বিস্তৃত ও নমনীয় হয়ে গেছে, যা নানা ব্যাখ্যার সুযোগ গ্রহণ করে। কারণ এর চারপাশে রয়েছে অসংখ্য বিস্তারিত দিক এবং বহুস্তরীয় প্রেক্ষাপট।

থিঙ্ক ট্যাঙ্কস এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হাওয়ার্ড জে. উইয়ার্ডা (Howard J Wiarda) বলেন, গবেষণা ও অধ্যয়নকেন্দ্রগুলো হলো এমন প্রতিষ্ঠান, যেগুলো গবেষণা ও শিক্ষার কাজ করে, তবে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের মতো করে নয়। এগুলো কোনো আনুষ্ঠানিক পাঠ্যক্রম প্রদান করে না; বরং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গবেষণা-ভিত্তিক পণ্য (মূলত গবেষণা প্রতিবেদন) তৈরি করে।

তাদের মূল লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রের পাবলিক পলিসি বা সাধারণ নীতিমালা নিয়ে গবেষণা করা এবং এসব নীতির আলোচনায় কার্যকর প্রভাব রাখা। তারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন,

জননীতি, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা ও বৈদেশিক সম্পর্কের মতো বিষয়গুলোতে গভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে থাকে। তারা এসব বিষয়ে ভাসমান তথ্য উপস্থাপন করে না; বরং গভীর বিশ্লেষণ ও বিতর্ক তৈরি করে এবং জনগণের দৃষ্টি এসব বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করে।

থিঙ্ক ট্যাঙ্কস শব্দগুচ্ছকে আরবিতে বিভিন্নভাবে অনুবাদ করা হয়। কেউ কেউ এর অনুবাদ করেন 'مراكز التفكير' (চিন্তাকেন্দ্র)। তবে সাধারণত এর অনুবাদ 'مراكز الأبحاث والدراسات' (গবেষণা ও অধ্যয়ন কেন্দ্র) হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমেরিকার আঞ্চলিক ভাষায় 'Brain boxes' শব্দটি ব্যবহার করা হতো সেসব কক্ষের জন্য, যেখানে কৌশলবিদরা সামরিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতেন।

মূলত গবেষণা ও অধ্যয়নকেন্দ্রের জন্ম ঠিক কখন হয়েছিল, লেখক এখানে সেসব বিষয়ে গবেষকদের মতভেদের কথা উল্লেখ করেছেন। কিছু গবেষক বলেন, এসব কেন্দ্রের প্রথম রূপের উৎপত্তি হয়েছিল ইউরোপের ইউনিভার্সিটিগুলোতে। বিশেষ করে দ্বাদশ শতকে, ইউরোপীয় ক্রুসেড যুদ্ধের প্রাক্কালে ইসলামি ইউনিভার্সিটিগুলোর অনুকরণে যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।

পরবতীকালে অষ্টাদশ শতকে এগুলো ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'الكراسي العلمية' (বৈজ্ঞানিক চেয়ার বা ইলমি চেয়ার) নামে পরিচিত হয়। এর প্রথম সূচনা ঘটে বোলোনিয়া (Bologna) ও প্যারিসে 'كراسي الدراسات الشرقية' (প্রাচ্য অধ্যয়ন চেয়ার) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

তবে নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী ১৮৩১ সালে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটেনে। রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউট (Royal United Services Institute) নামে। এরপর ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ফ্যাবিয়ান সোসাইটি (Fabian Society)। একই সঙ্গে ধর্মীয় অধ্যয়নকে উৎসাহিত করার জন্য ব্রিটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম দাতব্য সংস্থা 'ডিমোরেন্ট ট্রাস্ট' গড়ে ওঠে। গবেষকদের মতে, এসব 'চেয়ার' ছিল গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পূর্বাভাস।

অন্যদিকে অনেকে মনে করেন, গবেষণাকেন্দ্রগুলো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে নতুন একটি ধারণা। এর সূচনা হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবতী সময়ে। তখন এগুলো ছিল মূলত জনসম্মুখে আলোচনার মঞ্চ বা সমাজ ও নীতি-নির্ধারকদের ব্যস্ত রাখা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোর গবেষণার স্থান।

আধুনিক রূপে সর্বপ্রথম গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্রে :

- ১৯১০ সালে কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস (Carnegie Endowment for International Peace)
- একই বছরে ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশন (Brookings Institution)
- ১৯১৮ সালে হুভার ইনস্টিটিউশন (Hoover Institution)
- এবং ১৯১৯ সালে সেঞ্চুরি ফাউন্ডেশন (The Century Foundation)

কোল্ড ওয়ার বা স্নায়ুযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে গবেষণা ও অধ্যয়নকেন্দ্রগুলো দ্রুত বিস্তার লাভ

কিন্তু প্রশ্ন হলো, কবে শেষ হবে এই প্রহসন? কবে থামবে এই ধূর্ত খেলা, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘাম, পরিশ্রম আর উপার্জিত সম্পদ দিনের পর দিন লুটে নেওয়া হচ্ছে? মানুষ বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম করছে। তাদের বেতন ডলার দিয়ে দেওয়া হয়, অথচ সেই ডলারের মান প্রতিদিন কমে যাচ্ছে! মানুষের জীবিকা উন্নত হচ্ছে না। ক্রমশ জীবনযাত্রা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে।

এসব সাধারণ মানুষের সম্পদ লুট করে নিচ্ছে এমন একদল নিষ্ঠুর ও নির্মম চোর, যাদের নিজেদের জনগণ বা জাতির প্রতিও কোনো দয়া নেই; অন্যান্য জাতির কথা বাদই দিলাম!

তাহলে কি কোনো বিকল্প পরিকল্পনা আগে থেকেই প্রস্তুত করে রাখা আছে, প্রয়োজন এলেই তারা যা প্রয়োগ করবে? নিঃসন্দেহে আছে!

ভেবে দেখুন :

কৃত্রিম যুদ্ধ

বানানো সংক্রামক রোগ

বারবার উস্কে দেওয়া বিপ্লব

এমনকি পারমাণবিক বোমার ব্যবহার! যেখানে সবাই ধ্বংস হয়ে গেলেও তাদের একটাই লক্ষ্য থাকবে, নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা।

---

১. **গবেষণা ও বিশ্লেষণ**
জননীতির জটিল সমস্যা ও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোর ওপর গভীর ও পদ্ধতিগত গবেষণা ও বিশ্লেষণ করা।

২. **নীতি-নির্ধারকদের সহায়তা**
রাষ্ট্রনেতা ও নীতি-নির্ধারকদের জন্য বিকল্প উপস্থাপন, নীতি স্পষ্টকরণ এবং বিষয়গুলোকে নির্ভুল ও বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা। এজন্য বিশ্বের বহু সরকার ও নির্বাহী সংস্থা এসব কেন্দ্রের গবেষণা, অধ্যয়ন ও দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। অনেক সময় এসব কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক হিসেবেও কাজ করে।

টাকা তৈরির খেলা

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, আমেরিকান ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক আসলে কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যাংক নয়; বরং মাত্র কয়েকজন ধনী ব্যক্তির মালিকানাধীন একটি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান। বিস্ময়ের বিষয় হলো, যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সরকারি সংস্থা কখনোই এই ব্যাংকে তল্লাশি চালাতে পারে না। না আমেরিকার সর্বোচ্চ আদালত, না এফবিআই, এমনকি রাষ্ট্রের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানও নয়। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক এমন শক্তিশালী অভেদ্য সুরক্ষা পেয়েছে যে, এর ভেতরের কার্যক্রম একেবারেই নিরাপদ, যেখানে প্রবেশের অধিকার শুধু এবং শুধুই তাদের নিজেদের, অন্য কারও নেই।

এ ব্যাংকের সম্পদও কোনো সাধারণ সম্পদ নয়। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে আছে তাদের বিলাসবহুল প্রাসাদ, ব্যক্তিগত বিমানবহর, দৃষ্টিনন্দন খেলাধুলার মাঠ, অগণিত জমিজমা, এমনকি একাধিক দ্বীপও। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এই সবকিছুই তাদের অগাধ ক্ষমতা ও গোপন সাম্রাজ্যের প্রতীক।

তাহলে তাদের এই বৈশ্বিক খেলার নিয়ম বা বলা যায় 'বিশ্বব্যাপী ডাকাতির কৌশল' কীভাবে পরিচালিত হয়? খুব সরলভাবে পুরো প্রক্রিয়াটি এমন :

১. প্রথমে আমেরিকান ট্রেজারি বিভাগ অর্থাৎ সরকারি কোষাগার থেকে বন্ড বা ঋণপত্র ইস্যু করা হয়। এই বন্ডগুলো আন্তর্জাতিকভাবে নিলামে তোলা হয়। বিভিন্ন দেশ, ব্যাংক ও বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এই বন্ড কিনতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

২. সাধারণত এই নিলামের বড় অংশ দখল করে নেয় বৃহৎ ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকগুলো। যেমন সিটি ব্যাংক (City Bank) ও

অনুরূপ ব্যাংকসমূহ। আর এ ব্যাংকগুলোর মালিকরাও সেই একই চোরদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের হাতে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণও রয়েছে।

৩. এই ব্যাংকগুলো বন্ড কেনার পর সেগুলো নিয়ে যায় ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে। সেখানে ফেডারেল রিজার্ভ আবার সেই বন্ড কিনে নেয় এবং এর বিনিময়ে ব্যাংকগুলোকে দেয় চেক। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই চেকগুলোর পেছনে কোনো বাস্তব সম্পদ নেই, নেই স্বর্ণের ভান্ডার কিংবা প্রকৃত অর্থের নিশ্চয়তা!

অর্থাৎ পুরো লেনদেনটাই যেন এক মায়াজাল। কাগজে কাগজ ঘোরে, সংখ্যার খেলায় অর্থ সৃষ্টির ভান করা হয়, অথচ এর কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে এই কাল্পনিক কৌশলের ওপর।

এখান থেকেই শুরু হয় অদৃশ্য টাকা তৈরির খেলা!

কীভাবে?

কাগজের ডলার ছাপানোর মাধ্যমে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই কাগজের টুকরো, যাকে আমরা 'ডলার' বলি, তা কোটি কোটি কপি ছাপানোর নির্দেশ কে দেয়?

এই নির্দেশটা দেয় ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক, যেটা আদতে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান নয়; বরং একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংক। তারা নির্দেশ পাঠায় আমেরিকার নোট ছাপানোর কারখানা ইউএস মিন্টে (U.S. Mint), আমাদের এত মিলিয়ন ডলার ছাপিয়ে দাও! আমরা যেন না ভুলি যে, এই ব্যাংকটাই কিন্তু সেই 'বিশেষ' ব্যাংক![১৩]

---

১৩. যুক্তরাষ্ট্রের ডলার ছাপানোর কারখানার নাম ইউএস ব্যুরো অব এনগ্রেভিং অ্যান্ড প্রিন্টিং (U.S. Bureau of Engraving and Printing - BEP)। এটি ওয়াশিংটন, ডি.সি. এবং ফোর্ট ওয়ার্থ, টেক্সাসে অবস্থিত।
এ ছাড়াও আমেরিকান মুদ্রা তৈরি করা হয় ইউএস মিন্ট (U.S. Mint)-এ, যার প্রধান শাখাগুলো ফিলাডেলফিয়া, ডেনভার, সান ফ্রান্সিসকো এবং ওয়েস্ট পয়েন্টে অবস্থিত।
এই প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের (U.S. Department of the Treasury) অধীনে কাজ করে।

তারপর সেই ছাপা ডলারগুলো সরাসরি পৌঁছে যায় ব্যাংকগুলোর হাতে। আর এভাবেই তৈরি হয় নতুন অর্থ, যার পেছনে কোনো আসল সম্পদ বা বাস্তব রিজার্ভ নেই।

ট্যাক্সের রহস্য!

খেলাটা এখানেই শেষ নয়। ফেডারেল রিজার্ভ আবার সেই আমেরিকান অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে ফিরে আসে এবং বলে, 'এই নাও তোমার বন্ড, আর এর সাথে আমাকে সুদসহ টাকাটা ফেরত দাও।'

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমেরিকার খাজাঞ্চিখানা বা ট্রেজারি কীভাবে এই বিরাট ঋণ শোধ করবে? কীভাবে সেই ভয়াবহ সুদের টাকা মেটাবে, যা কখনো কখনো মূল ঋণের চেয়েও বহুগুণ বেশি হয়ে দাঁড়ায়?

দুঃখজনক হলেও সত্য, এই ঋণ শোধের টাকাটা তোলা হয় জনগণের ঘাড় থেকে। নানা অজুহাতে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় কর, ভাতা, ট্যাক্স।

মানুষ ভাবে, এই করের অর্থ দেশের উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কিংবা সড়ক ব্যবস্থার উন্নতিতে ব্যয় হয়। অথচ বাস্তবতা হলো, জনগণের হাতে ফেরত আসে এর সামান্যই, অতি সামান্য একটা টুকরো। বাকি পুরোটা গিলে ফেলে এই ঋণের সুদ নামের ভয়ংকর ফাঁদ।

ঋণের চক্র, টাকার চক্র ও ডলারের পতন-ধ্বনি

এখন প্রশ্ন হলো, এই প্রক্রিয়া কতদিন চলতে থাকবে? ঋণের সীমা (Debt Ceiling) অতিক্রমের কারণে কি পরিস্থিতি ভেঙে পড়বে? আর কতদিন সরকার এই বেসরকারি ব্যাংক (ফেডারেল রিজার্ভ) থেকে ধার করতে থাকবে? যেখানে এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, সরকারের ঋণ এখন জাতীয় উৎপাদনের চেয়েও বেশি!

এমতাবস্থায় যদি সরকার ঋণ নেওয়া বন্ধ করে দেয়, তাহলে নোট ছাপানোও বন্ধ হয়ে যাবে। তখন মানুষও আর ঋণ নিতে পারবে না। কেননা প্রতিটি ডলার ধার নেওয়ার মাধ্যমে আরেকজন উপকৃত হয়। এটিকেই বলা হয় 'টাকার ঘূর্ণনচক্র' (Cycle of Money)।

কিন্তু যখন মানুষ ঋণ নেওয়া বন্ধ করবে, তখন ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে যাবে। এর পরিণামে তৈরি হবে মন্দা (Recession)। চাহিদা কমে যাবে আর সরবরাহ বেড়ে যাবে।

এটি এক ভয়াবহ জটিল অবস্থা। কারণ যদি সরকার ঋণ নেওয়া বন্ধ করে দেয়, তাহলে মানুষ বাধ্য হবে সাশ্রয়ী হতে, নিজেদের হাতে যা আছে তাই আঁকড়ে ধরতে। পরিস্থিতি তখন ভয়াবহ হয়ে যাবে। তারচেয়েও ভয়ংকর আশঙ্কা হলো, যদি সরকার দেউলিয়া ঘোষণা করে বসে!

ভাবুন তো, আপনি যদি ঋণ নেওয়া বন্ধ করে দেন, ব্যাংকগুলো কি চুপচাপ বসে থাকবে? নিশ্চয়ই না। তারা আপনার কাছে তাদের প্রাপ্য ঋণ ফেরত চাইবে। একইভাবে ফেডারেল রিজার্ভ ক্রমাগত ট্রেজারির কাছে ঋণ পরিশোধের দাবি জানাবে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তাদের পাওনা আদায়ের চেষ্টা করবে। তখন মানুষের একমাত্র মনোযোগ থাকবে, যেভাবেই হোক ঋণ পরিশোধ করা।

ফলে কী হবে? ধীরে ধীরে বাজার থেকে প্রকৃত অর্থ গায়েব হতে শুরু করবে। কিন্তু ঋণ থেকে যাবে পাহাড়সম! যা শোধ করা কারও পক্ষেই সম্ভব হবে না। আর তখনই নেমে আসবে ভয়াবহ ধ্বস।

এভাবেই শুরু হবে ডলারের পতন। আর যদি ডলার ধ্বসে পড়ে, তাহলে পুরো বিশ্বের মুদ্রাব্যবস্থা এক নিমিষেই ভেঙে পড়বে!

আমেরিকান সরকার ঋণ শোধ করছে না, ব্যাংকগুলোও ঋণ শোধ করছে না, আমার রাষ্ট্রও ঋণ শোধ করছে না, আপনার রাষ্ট্রও ঋণ শোধ করছে না। কেউই কিছু করছে না, করতে পারছে না।

ফলে নিশ্চিতভাবেই সরকারগুলো ভেঙে পড়বে, কোম্পানিগুলো ধ্বসে পড়বে, চাকরির ক্ষেত্র ভেঙে পড়বে এবং কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে।

যদি এমন ঘটে, তবে ভয়াবহ পতন ঘটবে, আর এতে সবাই ডুবে যাবে কষ্টের সাগরে। সবাই ক্ষুধার্ত হবে, বস্ত্রহীন হবে, পৃথিবী ডুবে যাবে কালো অন্ধকার দিনের মধ্যে। অপরাধ বেড়ে যাবে, চেতনা কমে যাবে। কারণ ক্ষুধায় মরার ভয়ে মানুষ তখন সবকিছুকে তুচ্ছ মনে করবে।

এখন পুরো ব্যাপারটাই আল্লাহ তাআলার হাতে। তিনি ছাড়া রক্ষা করার কেউ নেই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য।

সূত্রসমূহ :

ড. আদনান ইবরাহিমের বক্তৃতা : ইনহিয়ারুল আলাম (বিশ্বের পতন)।

আরব ও পাশ্চাত্যের আলেমদের লেখা কিছু বই ও বক্তৃতা।

বিশেষজ্ঞদের গবেষণা ও প্রতিবেদন।